বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

এপ্রিল ২০১৩, চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৯-১৪২০

সম্পাদকীয়

বাঙালির প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব বাংলা নববর্ষ। প্রাণের উচ্ছ্বাসে প্রতিটি বাঙালি বৈশাখকে বরণ করে নিতে যাচ্ছে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালিরা পালন করছে নববর্ষ।

বাংলার প্রকৃতি পরিবেশই এখানে সবার শিক্ষক। এই ধরাতেই পলিমাটির গন্ধ, দুরন্ত বাতাস, ফল-ফুল-ফসলে রূপ মাধুর্য, নদীর প্রবহমানতার ছন্দে গড়ে উঠেছে আরেক মানস জগৎ। যার প্রকাশ বাঙালিয়ানায়। প্রকৃতি পরিবেশই সাজিয়ে দিয়েছে ভিন্ন এক সংস্কৃতি, জীবনচয়নের মঞ্চ। একে বিসর্জন দিয়ে নয়, এগোতে হবে নিজস্বতাটুকুকে ধারণ করেই।

১৪২০ বাংলা সালের প্রথম দিন থেকে সবারই চাওয়া হোক 'যাক পুরাতন স্মৃতি/যাক ভুলে যাওয়া গীতি/অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক'। সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  গোলাম মহিউদ্দীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
- **প্রচ্ছদ**
  মালেক টিপু
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

স্মৃতিময় দিনগুলো

জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ ব্যাংকের এস.এম.হাবিব নামে খ্যাত এস. এম. হাবিবুর রহমান স্মৃতিময় দিনগুলো'র এবারের অতিথি। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করে ৩৫ বছরের সফল কর্মজীবন শেষে ২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিকালে তিনি অফিসের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যাংক ক্লাবসহ অন্যান্য সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ হতে জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনেও তার অবাধ বিচরণ। এবার তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়েছেন তার অনেক অনেক আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতি নিয়ে।

বর্তমানে আপনি কি করছেন?

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত থাকার সময়েই আমি বিভিন্ন সংগঠন যেমন, খোখো ফেডারেশন, কাবাডি ফেডারেশন ইত্যাদির সাথে যুক্ত ছিলাম। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আমি এ সকল দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করি নি। বর্তমানে আমি খোখো ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। দিনের একটি বড় অংশ আমি এখানেই ব্যয় করি। এই দায়িত্ব পালন করে আমি খুব আনন্দ পাই।

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমার স্ত্রী সংসারের প্রতি অনেক আন্তরিক। পরম মমতায় তিনি আমার পরিবারকে আগলে রেখেছেন। আমার এক ছেলে, সে ব্যবসা করছে। মেয়েও একটি। সে বিবাহিতা।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আপনার ভূমিকা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবে আমি দু'বার সাধারণ সম্পাদক এবং একবার ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ব্যাংক ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক থাকাকালীন একবার আন্তঃঅফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সকল দায়িত্ব ছিল আমার কাঁধে। অনুষ্ঠানের আগের দিন মধ্য রাত পর্যন্ত হকি স্টেডিয়ামে মাঠ প্রস্তুত করে বাড়ি ফিরলাম। সে রাতে প্রচণ্ড ঝড় হয়। পরদিন সকালে মাঠে গিয়ে দেখলাম সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক মূহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমরা আবার কাজে লেগে গেলাম এবং প্রধান অতিথি আসার সাথে সাথে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম। এটা ছিল আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ।

চাকরি জীবনে যাদের সহযোগিতা পেয়েছেন তাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

কর্মকালীন ও ক্লাবের দায়িত্ব পালনকালে আমি বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাহায্য পেয়েছি। এর মধ্যে বলা চলে সাবেক ডেপুটি গভর্নর আতাউল হক এর কথা। ক্লাবের দায়িত্ব পালনে সব সময়ই আমি তার সহযোগিতা পেয়েছি। গাজী সাইফুর রহমান, আনিসুজ্জামান লালু, ম. মাহফুজুর রহমান– তারাও ক্লাবের কাজে অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং পাশে থেকেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের আরও উন্নয়নের জন্য কী করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

২০০২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে গেলেও বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমানের ঐকান্তিক উদ্যোগে তা আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তবে বর্তমানে ব্যাংক ক্লাবটি যে স্থানে অবস্থিত সেখানে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কর্মকর্তারা যান না। বহিরাগতদের আগমনে ক্লাবের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এই কারণে ক্লাবের স্থান পরিবর্তন করা জরুরি। অনুদানের ক্ষেত্রে ঢাকার ক্লাবের পাশাপাশি বাইরের অফিসের ক্লাবগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রাক্তন গভর্নর নূরুল ইসলাম এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন এস.এম. হাবিবুর রহমান

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের জন্য আপনার কি বক্তব্য?

দিনের একটি বিশাল অংশ– সামগ্রিকভাবে জীবনের একটি বড় সময় আমরা ব্যয় করি অফিসে। তাই নিজের ডিপার্টমেন্ট, অফিসকে পরিবারের মত মনে করতে হবে। সবার সাথে মিলে মিশে চলতে হবে। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথেই শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য নতুন কর্মকর্তাদের ক্লাবে যাওয়া উচিত।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মহামান্য রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে
গভর্নর এর শোক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ মোঃ জিল্লুর রহমান এর আকস্মিক মৃত্যুতে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মরহুমের পরিবারের নিকট প্রেরিত এক শোকবার্তায় গভর্নর বলেন: "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাজনৈতিক সহযোদ্ধা, ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশের অন্যতম সংবিধান রচয়িতা, জাতীয় সংসদের উপনেতা, দেশের রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির সাহসী ভূমিকা পালনকারী, প্রায় সাত দশকের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান এর অবদান চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। দেশপ্রেম, জাতীয় রাজনীতি ও দেশের মানুষের কল্যাণে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। জনাব রহমান এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক গর্বিত কৃতি সন্তানকে হারালো। তাঁর এ শূন্যতা কখনো পূরণ হবার নয়। সর্বদা ধীরস্থির, সূক্ষ্ম বিচারবোধসম্পন্ন, সৎ, সাহসী ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনাব রহমান এর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাভিভূত। আমি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।"

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংকে শোকসভা

মোঃ জিল্লুর রহমান ছিলেন ঐক্যের প্রতীক, অজাতশত্রু এবং একজন দৃঢ়চেতা মানুষ। তাঁর শূন্যতা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়।

সদ্যপ্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান স্মরণে ২৫ মার্চ, ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত এক স্মরণসভায় বক্তারা একথা বলেন। প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী এবং এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) এর সভাপতি মোঃ নূরুল আমিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। গভর্নর তাঁর বক্তব্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আজীবন নীতি ও আদর্শে অবিচল মোঃ জিল্লুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জনগণ ও দেশের কল্যাণে রাজনীতি করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি অভিভাবক হারিয়েছে, দেশ হারিয়েছে এক মহান নেতাকে।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা, এবিবি'র চেয়ারম্যান মোঃ নূরুল আমিন, বাংলাদেশ ব্যাংক সিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সবুর, ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহমুদ হোসেন, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জিম ম্যাককেব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সালাম, পূবালী ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হেলাল আহমদ চৌধুরী এবং অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবদুল হামিদ।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতির স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত শোকসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে) ডেপুটি গভর্নর এস.কে.সুর চৌধুরী, ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ও এবিবি'র সভাপতি মোঃ নূরুল আমিন

বিমস্‌টেক এর সাব-গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত

সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক বিমস্‌টেক সাব-গ্রুপ এর ৫ম সভা ৬ -৮ মার্চ, ২০১৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক আয়োজিত এই সভায় বিমস্‌টেক এর সদস্যভুক্ত দেশ বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এবারের সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে সন্ত্রাসে অর্থায়ন। গভর্নর ড. আতিউর রহমান সভার উদ্বোধন করেন। ডেপুটি গভর্নর ও বিএফআইইউ প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএফআইইউ এর অপারেশনাল হেড ও মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিমস্‌টেক সচিবালয়ের পক্ষ থেকে থাইল্যান্ডের এফআইইউ এর পরিচালক উইকুন নিথিমুত্রাকুল।

বিমস্‌টেক সভায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

সিলেটে অফিসার্স এসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের ক্যাশ বিভাগের অফিসার্স এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ২৩ জানুয়ারি ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সভাপতি পদে আশরাফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল কাইয়ূম নির্বাচিত হন। সহ সভাপতি পদে আবুল কালাম আজাদ ও আশক আলী, সহ সম্পাদক পদে সুব্রত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ মোঃ সামছুল হক এবং সদস্য পদে মোঃ ছালেহ আহমদ, মঈন উদ্দিন, বিনয় ভূষণ রায়, মহিউদ্দিন আহমদ ও শামীম আহমদ নির্বাচিত হয়েছেন।

পহেলা বৈশাখের কথা

মিলটন বিশ্বাস

পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশে পালিত হয় বাংলা নববর্ষ নামে। পহেলা বৈশাখ মহা উৎসাহের সঙ্গে বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামে বসবাসকারী বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে পালিত হয়। বাংলা নববর্ষ ধর্মীয় এবং আঞ্চলিক পার্থক্যের বেড়াজাল ভেঙে সকল বাঙালির সেতুবন্ধন। এ উপলক্ষে সমস্ত জাতি সমৃদ্ধি, মঙ্গলকামনা এবং নতুন আশায় নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ সাধারণত জর্জিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে এপ্রিল মাসের ১৪ বা ১৫ তারিখে পড়ে, সরকারি সংশোধিত ক্যালেন্ডার (বাংলা একাডেমীর ডিজাইন) অনুযায়ী এটি একটি জাতীয় ছুটির দিন যা ১৪ এপ্রিল পালিত হয়।

> '... বাংলা নববর্ষ ধর্মীয় এবং আঞ্চলিক পার্থক্যের বেড়াজাল ভেঙে সকল বাঙালির সেতুবন্ধন। এ উপলক্ষে সমস্ত জাতি সমৃদ্ধি, মঙ্গলকামনা এবং নতুন আশায় নতুন বছরকে স্বাগত জানায়...'

মুঘল সম্রাট জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর ১৬শ শতকের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থে বাংলা বছর চালু করেন। আমির ফতেউল্লাহ সিরাজী, যিনি আকবর এর নবরত্ন সভার সদস্য ছিলেন, তিনি হিজরি চন্দ্র এবং সৌর ক্যালেন্ডারের সংমিশ্রণে এই ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন করেন। প্রাথমিকভাবে এই ক্যালেন্ডারটি *ফসলি সন বা কৃষি বছর* নামে নামকরণ করা হয় এবং তারপর *বঙ্গাব্দ* বা বাংলা বছর নামে অভিহিত হয়। এটি ৫ নভেম্বর ১৫৫৬ বা ৯৬৩ হিজরি তারিখ থেকে প্রচলিত ছিল, কেননা এই দিনে আকবর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলা ক্যালেন্ডার চালুর ফলে অধিকতর সহজ উপায়ে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। সম্রাট আকবরের আদেশ অনুযায়ী হিজরী ৯৬৩ সনের ১০ রবিউল আওয়াল-কে তারিখ-ই-এলাহী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নতুন বাংলা ক্যালেন্ডারের (তারিখ-ই-এলাহী) মাসগুলো প্রথম দিকে নিম্নোক্ত নামে পরিচিত ছিল–

১) কারওয়াদিন ২) আরদি ৩) ভিষু ৪) খোরদাদ ৫) তীর ৬) আমারদাদ ৭) কাহরীয়ার ৮) আবান ৯) আযুর ১০) দাই ১১) বাহাম ১২) ইসকান্দার মিজ। তবে নিশ্চিত করে এটা জানা যায় না কবে থেকে বাংলা মাসের নাম বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ হিসেবে অভিহিত হচ্ছে। ধারণা করা হয় শাখা সাম্রাজ্যের সময় থেকে, আনুমানিক ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে, তারকা'র নাম অনুসারে বাংলা মাসের নামকরণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ঃ ১) তারকা বৈশাখা থেকে বৈশাখ ২) জৈইষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ ৩) ষাড় থেকে আষাঢ় ৪) শ্রাবনী থেকে শ্রাবণ ৫) ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র ৬) অশ্বিনী থেকে আশ্বিন ৭) কার্তিক থেকে কার্তিক ৮) অগ্রাহইন থেকে অগ্রহায়ণ ৯) পউশ থেকে পৌষ ১০) মাঘা থেকে মাঘ ১১) ফালগুনী থেকে ফালগুন এবং ১২) চিত্রা থেকে চৈত্র।

অনেকে বলে থাকেন শশাংক (মহা সেনগুপ্তের পুত্র) যিনি একদা বাংলার রাজা ছিলেন, তার আসাম রাজ্য জয়-কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলা সন চালু করেন। কিন্তু ইতিহাসের কোথাও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না কেননা তিনি বেনারস জয়ের পর চিলকা হ্রদের দিকে যাত্রা করেন। কখনোই আসামের অভিমুখে আসেননি।

পহেলা বৈশাখ এর আনুষ্ঠানিকতা উদ্‌যাপনও আকবরের হাত ধরে আসে। মহান আকবর তারিখ-ই-এলাহী চালু করার পর এতদিন ধরে চলে আসা অন্যান্য ইসলামিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে ১৪টি নতুন উৎসব চালু করেন। যার মধ্যে একটি হলো *নওরোজ* বা নতুন বছরের প্রথম দিন উদ্‌যাপন। এমন একটি অনুষ্ঠানেই রাজপুত্র সেলিম (পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর) মেহেরুন্নেসার (ইতিহাসে নূরজাহান নামে খ্যাত) প্রেমে পড়েন। ঠিক এমনই একটি নওরোজে রাজপুত্র খুররম (পরবর্তীতে সম্রাট শাহজাহান) প্রথমবার মমতাজ মহলে আসেন। এই মমতাজমহল যেটি কিনা মার্বেল পাথরের কাব্যগাথা, সমগ্র পৃথিবীর কাছে তাজমহল নামে পরিচিত। যদি বাংলা নববর্ষ না থাকত তবে হয়তো কোন নূরজাহানও থাকত না কোন তাজমহলও থাকত না। সম্রাট আকবরের নির্দেশনা অনুসারে পহেলা বৈশাখে বাড়ির মালিকরা তাদের ভাড়াটেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করবে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের পুরানো খাতাটি বন্ধ করে একটি হালখাতা খুলবে। ব্যবসায়ীরা তাদের গ্রাহককে আমন্ত্রণ জানাবে এবং মিষ্টি বিতরণ করে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক নতুন করে ঝালাই করে নিবে। আর এভাবে মেলা এবং উৎসবের সঙ্গে ধীরে ধীরে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের একটি দিন হয়ে ওঠে।

এবার ইতিহাসের পাতা থেকে বাংলাদেশের পাতায় চোখ রাখা যাক।

বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মেঘনাদ সাহা-এর নেতৃত্বে বাংলা একাডেমীর

তত্ত্বাবধানে ১৯৬৩ সালে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশে ১৪ এপ্রিল তারিখটি বাংলা নববর্ষ হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করা হয়। বাংলা নববর্ষ একটি সর্বজনীন উৎসব। রবীন্দ্রনাথ বলেন, '.... *প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ...*'।

সাধারণত এই দিনে সবকিছু ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়; সবাই ভাল কাপড় পরেন এবং তারপরে আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছে যান, বিশেষ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন। বাঙালি পুরুষ সাধারণত পায়জামা, লুঙ্গি, ধুতি পরেন। তবে জিন্সের প্যান্ট এবং পাঞ্জাবিও পরে তরুণেরা। নারীরা লাল পাড়ের সাদা শাড়ি, টিপ, চুড়ি এবং ফুল দিয়ে নিজেদের অলঙ্কৃত করে। পান্তা ভাত, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, আচার, ভাজা ইলিশ মাছ খেয়ে দিন শুরু করা হয়।

বাংলার বেশিরভাগ অঞ্চলে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় প্রদর্শিত হয় গ্রামীণ বাংলার জীবনধারা। বিভিন্ন ঐতিহ্যগত হস্তশিল্প, খেলনা, প্রসাধনী, কৃষি পণ্য, যেমন খাদ্য এবং মিষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য এই মেলায় বিক্রি করা হয়। এছাড়াও মেলায় গান, নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। লোক গান হিসেবে বাউল, মারফতি, মুর্শিদি এবং ভাটিয়ালি গান উপস্থাপন করা হয়। মঞ্চস্থ করা হয় লাইলী-মজনু, রাধা-কৃষ্ণ আখ্যান নাটক। এইসব মেলার অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে পুতুল নাচ, রাধাচক্র এবং জায়ান্ট চাকা অন্যতম। গ্রামে জনপ্রিয় খেলা হলো ঘোড়দৌড়, মোরগলড়াই, উড়ন্ত পায়রা এবং নৌকা বাইচ।

পহেলা বৈশাখের প্রত্যুষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এর ছাত্র-ছাত্রীরা মঙ্গলশোভাযাত্রা বের করে। ১৯৮৯ সালের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্থানটি এবং রমনা বটমূল একটি প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ঢাকাসহ রাজশাহী এবং চট্টগ্রামের মত বড় শহরে এই দিন শত শত কনসার্ট এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছায়ানট শিল্পীরা রবি ঠাকুরের বিখ্যাত গান, *এসো, হে বৈশাখ, এসো এসো* গান গেয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

লেখক: সহকারী পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

বিবিটিএ'তে আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী এবং CICTAB (Center for International Cooperation and Training in Agricultural Banking), India এর যৌথ উদ্যোগে ৬-১০ জানুয়ারি, ২০১৩ Agricultural Financing and Rural Development শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক Trainer's Training প্রোগ্রাম বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত হয়।

এ কোর্সে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল থেকে ১০জন সহ মোট ৩০জন দেশী ও বিদেশী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, বিআইবিএম, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, পিকেএসএফ এর প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি ভারতের চারজন বিশেষজ্ঞ বক্তা এ কোর্সের সেশনসমূহ পরিচালনা করেন। এ প্রোগ্রামের মূল বিষয়বস্তু ছিল ব্যাংক, সমবায় এবং গ্রামীণ অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তাদের স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিচিত করা এবং এবিষয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদানে পারঙ্গম করে তোলা। কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বগুড়ার রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমী এবং পাবনার মিল্কভিটায় শিক্ষাসফর এবং ঢাকা শহরে সিটি ট্যুর এর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, CICTAB সার্ক দেশসমূহে তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে নিয়মিত এজাতীয় আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম করে থাকে।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ও বিবিটিএ কর্মকর্তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা এ প্রোগ্রামটি উদ্বোধন করেন। সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। মহাব্যবস্থাপক সেখ মোজাফফর হোসেন এর সভাপতিত্বে উভয় অনুষ্ঠানে বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া CICTAB এর ডাইরেক্টর ড. দিনেশ এবং কনসালটেন্ট ড. ডি রবি যথাক্রমে উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর যুগ্ম পরিচালক নাহিদ রহমান এবং মহাব্যবস্থাপক সেখ মোজাফফর হোসেন যথাক্রমে এ প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী ও ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়ক ব্যাংকিং পরিবেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তিনি সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী তার সমাপনী ভাষণে দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়নের জন্য এবিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত দেশী বিদেশী সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন

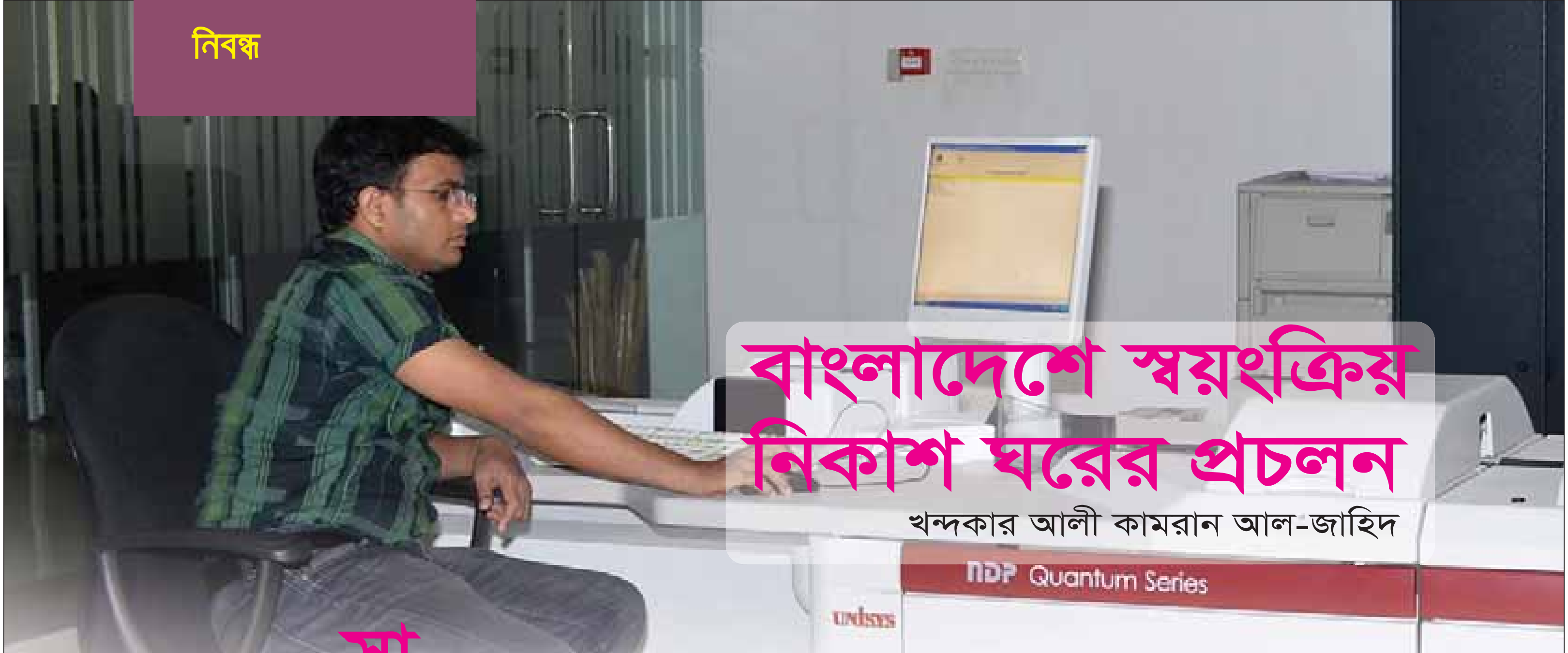

বাংলাদেশে স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘরের প্রচলন

খন্দকার আলী কামরান আল-জাহিদ

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ ব্যাংক তথা দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য একটি যুগান্তকারী অর্জন। BACH আমাদের নিকাশ ব্যবস্থার পুরো অবয়বকে পাল্টে দিয়েছে। দ্রুত গতি ও নিরাপদ বিচারে এটি বিশ্বের আধুনিকতম নিকাশ ব্যবস্থার একটি। উপমহাদেশের এমনকি উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত এ নিকাশ ব্যবস্থা অগ্রগণ্য।

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম্‌স (BACPS) ঃ BACPS এর আওতায় দেশের সনাতনী Physical Exchange পদ্ধতির নিকাশ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে প্রযুক্তি নির্ভর এবং অত্যাধুনিক Image Exchange পদ্ধতির চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। এরই অংশ হিসেবে প্রথমেই দেশের সকল ব্যাংক ইন্সট্রুমেন্টকে Machine Readable করার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং গ্রাহকদের নিকট স্থিত পুরাতন চেকগুলো উঠিয়ে নিয়ে (Phase Out) তাদেরকে নতুন ইন্সট্রুমেন্ট সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি এসকল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লিয়ারিং হাউজে উপস্থাপনের জন্য অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংগ্রহ করে এবং কেন্দ্রীয় ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার সাথে Communication Link স্থাপন করে। কেন্দ্রীয় ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে BACH ডাটা সেন্টার এবং মিরপুরে বিবিটিএ-তে এর ডিজাস্টার রিকভারি সাইট গড়ে তোলা হয়।

সকল তফসিলি ব্যাংকের সফল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৭ অক্টোবর ২০১০ হতে মতিঝিল ক্লিয়ারিং হাউজে BACPS-এর অবিরত কার্যক্রম শুরু হয়। স্বয়ংক্রিয় এ নিকাশ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ক্লিয়ারিং চেক নিয়ে প্রতিদিন দু'বার ক্লিয়ারিং হাউজে আসতে হচ্ছে না। ফলে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর সময় এবং শ্রমের সাশ্রয় হচ্ছে। এ ছাড়াও পূর্বের ব্যবস্থার ন্যায় ব্যাংকগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ক্লিয়ারিং হাউজে তারল্য সংরক্ষণ করতে হচ্ছে না যা তাদের তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধাজনক। অপরদিকে ব্যাংক গ্রাহকেরা একদিনে চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন বিশেষত আন্তঃবিভাগীয় চেকগুলোর অর্থও অপরাপর চেকের ন্যায় একদিনেই ক্লিয়ারিং হচ্ছে। ঢাকা ক্লিয়ারিং হাউজের কার্যক্রম শুরুর পর পর্যায়ক্রমে তা বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত অপর ৭টি এবং সোনালী ব্যাংক পরিচালিত ৩৩টি ক্লিয়ারিং হাউজে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ছাড়াও যে সমস্ত জেলা শহরে নিকাশ ব্যবস্থা ছিল না পর্যায়ক্রমে সে সকল জেলায় এ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রায় ৮৫% শাখা ক্লিয়ারিং হাউজের আওতাভুক্ত হবে। স্বয়ংক্রিয় এ নিকাশ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

- ***Machine Readable* চেক প্রবর্তন ঃ** অটোমেটেড ব্যবস্থায় উপস্থাপিত ইন্সট্রুমেন্টসমূহ Standardized হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় প্রথমেই বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের চেক Standardized করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নতুন এ চেকগুলো অভিন্ন আকার ও ডিজাইনের এবং হালকা রংয়ের (Image Friendly) হয়। এছাড়াও প্রতিটি চেকের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ একটি বিশেষ ধরনের (MICR) কালিতে চেকের নিচের অংশে মুদ্রিত থাকে, যার ফলে চেকটি মেশিন রিডেবল হয়।
- ***চেক প্রসেসিং সংক্রান্ত হার্ডওয়্যার এবং সফট্‌ওয়্যার স্থাপন ঃ*** অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজে চেকের Image প্রেরণ এবং ক্লিয়ারিং হাউজ হতে অপরাপর ব্যাংক কর্তৃক উপস্থাপিত চেক Image গ্রহণের সক্ষমতা অর্জনের জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যাংক প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফট্‌ওয়্যার সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত Specification অনুসারে বেশ কিছু স্থানীয় এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠান ব্যাংকগুলোর চেক প্রসেসিং সফট্‌ওয়্যার সরবরাহ করে। এছাড়া কয়েকটি ব্যাংক নিজেরাই সফট্‌ওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নেয়। স্থাপিত হার্ডওয়্যার এবং সফট্‌ওয়্যারের বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন-পরিমার্জনের মাধ্যমে তা ব্যবহার উপযোগী করা হয়।
- ***অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর সাথে Communication Link স্থাপন ঃ*** স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘরে চেক Image এবং তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় নিকাশ ব্যবস্থার একটি নিরাপদ

Communication Link স্থাপন করার প্রয়োজন পড়ে। এ লক্ষ্যে দেশের Internet Service Provider (ISP) দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় চারটি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয় এবং প্রতিটি ব্যাংক এদের মধ্যে যেকোন দুইটি প্রতিষ্ঠান হতে Link স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। নিকাশঘরের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়টি নিরাপদ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজে তিন স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। তথ্য আদান-প্রদানে এখানে Virtual Private Network (VPN) ব্যবস্থা, Encryption Technology এবং Public Key Infrastructure (PKI) ব্যবহৃত হয়েছে ।

বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)ঃ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের অপর Component বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে কেবলমাত্র ক্রেডিট লেনদেনের মাধ্যমে তার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে BEFTN এর আওতায় ডেবিট লেনদেন পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। EFT লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে অটোমেটেড চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতকৃত অবকাঠামো (Communication Link ও Security Protocol) ব্যবহৃত হয়। চেক এবং EFT ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, চেকে লেনদেনের জন্য ইন্স্ট্রুমেন্ট প্রয়োজন যা EFT লেনদেনের জন্য প্রয়োজন নেই। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্দেশনার আলোকে EFT লেনদেন সম্পাদন করে থাকে। এ ধরনের নির্দেশনা প্রদানের পদ্ধতি কি হবে তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিজস্ব অবকাঠামো এবং গ্রাহকদের ইচ্ছার ওপর। অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যাংকের Core Banking System (CBS) রয়েছে এবং যারা গ্রাহকদের Internet/Online ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহকেরা ঘরে/অফিসে বসে BEFTN এর মাধ্যমে অপর ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করতে পারবেন। EFT পদ্ধতিতে লেনদেন সম্পাদন করা সুবিধাজনক এবং চেকের তুলনায় ব্যয় সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও দ্রুত।

স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অপরাপর নিয়ামকগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ***দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোকবল তৈরি ঃ*** স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম একদিকে যেমন আমাদের দেশের জন্য ছিল নতুন, তেমনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ জনবলের ছিল অভাব। আরপিপি প্রকল্পের আওতায় অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী প্রতিটি তফসিলি ব্যাংকে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞ বিদেশী প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষিত করা হয়। যথাযথ ও বাস্তবমুখী এসকল প্রশিক্ষণের ফলেই দেশে স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীকালে এর নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়।
- ***স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর পরিচালনার নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ঃ*** স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘরের কারিগরি দিকগুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা ছিল জরুরি। বিষয়টি এ দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য ছিল একেবারেই নতুন, নিয়ম-নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম্‌স ডিভিশনের কর্মকর্তাগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন নিয়ে পড়াশোনা করেন, প্রকল্পের বিদেশী পরামর্শকগণের সহায়তায় স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর পরিচালনার নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত দুটি দলিল প্রণয়ন করা হয়, এগুলো হচ্ছে ঃ ১) Bangladesh Automated Cheque Processing System Operating Rules and Procedures এবং ২) Bangladesh Electronic Funds Transfer Network Operating Rules। স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘরে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যাংক এসকল নিয়ম-নীতি মেনে চলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।
- ***প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ*** বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ প্রকল্পটি দেশের পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। দেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের আকার এবং তাদের ICT অবকাঠামো ছিল বিভিন্ন ধরনের। সকল ব্যাংকে অত্যাধুনিক এ নিকাশ ব্যবস্থা প্রবর্তন কোন সহজসাধ্য কাজ ছিল না। অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের জন্য প্রথমে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং সকল কার্যাবলী বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক, তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের ভেন্ডর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তার ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় ৭৫টি প্রতিষ্ঠান সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তাদের সময়ানুগ বাস্তবায়ন ছিল একটি কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাংক এবং তাদের ভেন্ডরদের তাগাদা প্রদান করাও ছিল একটি জরুরি কাজ। এ প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দাতা সংস্থা হতে নির্বাচিত একজন বিদেশী পরামর্শক Project Manager-এর দায়িত্বে ছিলেন।

লেখক: ডিডি, পেমেন্ট সিস্টেম্‌স ডিপার্টমেন্ট

কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন

মকবুল হোসেন সজল

সৈকত শহর কক্সবাজার তখনো জেগে ওঠেনি। পূব আকাশে একটু একটু লালচে আভা। মায়াবী আঁধার লেগে আছে শহরের শরীরময়। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। একটু দূরেই নীল ফেনিল জলের মিছিল এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে পর্যটন শহর কক্সবাজারকে। পূর্ব নির্ধারিত রেস্ট হাউজে উঠেই দ্রুত তৈরি হয়ে দুই বন্ধু পরিবারের সবাই ছুটলাম সমুদ্র পাড়ে। সাগরতট কিছুটা নির্জন। সূর্য ওঠার পূর্বক্ষণে সমুদ্র আপ্লুত করে দিল সমস্ত চেতনাকে। দীর্ঘ ভ্রমণের সব ক্লান্তি মুহূর্তেই উবে গেল সমুদ্র দর্শনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যরশ্মি আছড়ে পড়লো বালির ওপর। ঝিকমিক করে উঠলো বালি, আর সমুদ্র নিত্যদিনের মত তার শরীরে মেখে নিল সোনার কণাকে। সূর্য ওঠার সাথে সাথে সাগরপাড়ে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে লাগলো। কেউ একা, কেউ মধুচন্দ্রিমা যাপনে, কেউবা পিকনিকের দলে। কেউ বর্ণিল ছাতার তলে আয়েশী চেয়ারে বসে সমুদ্র দেখছেন, কেউ সমুদ্র তটে হাঁটছেন, কেউ দৌড়াদৌড়ি করছেন, কেউবা সমুদ্র স্নানে ব্যস্ত। সাগর জলে গা ভেজাতে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে মতো ডুবলাম-ভাসলাম, বালুচরে খেললাম।

বিকেলে বীচে ছুটলাম সূর্যাস্ত দেখতে। তখন সাগর পাড়ের অন্য চেহারা। সৈকতজুড়ে হাজার হাজার মানুষ। সবাই তাকিয়ে আছে পশ্চিম আকাশে– যেখানে সূর্য একটু পরেই মুখ লুকাবে সাগর'বুকে। অসংখ্য ক্যামেরা ক্লিক করে উঠছে অস্তমান সূর্য, বিশাল সমুদ্র আর প্রিয়জনের প্রিয় মুখকে ধরে রাখার জন্য। আমরা সবাই অপলক তাকিয়ে আছি অস্তগামী সূর্যের দিকে। টকটকে লাল সূর্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে নীল সমুদ্র। অপরূপ সে দৃশ্য! স্থির হয়ে থাকা চোখের সামনেই লাল আগুনের গোলক পিণ্ডের মতো সূর্যটা এক সময় টুপ করে তলিয়ে গেল গভীর সমুদ্রে।

পরদিন ভোর পাঁচটা। সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে টেকনাফ যাওয়ার বাসে উঠলাম আমরা। দু'ধারে উঁচু পাহাড়, মাঝখানে আঁকা-বাঁকা পিচঢালা পথ। বাস হঠাৎ করে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে আবার কোথাওবা খাড়া নিচের দিকে নামতে থাকে। একদিকে বাংলাদেশের পাহাড় সবুজ আর সবুজ, অন্যদিকে নাফ নদী নীল আর নীল। এই নীল সবুজের খেলায় নিজের অজান্তেই পৌঁছে গেলাম টেকনাফ বন্দরঘাটে। আসা যাওয়ার টিকেট সংগ্রহ করে দীর্ঘ জেটি পেরিয়ে কেয়ারী সিন্দাবাদে উঠে পড়ে নির্ধারিত সীটে বসে পড়লাম। নারী পুরুষ শিশু মিলে প্রায় আড়াইশত যাত্রী নিয়ে নয়টার পর রওয়ানা হলো কেয়ারী সিন্দাবাদ। চললো নাফ নদীর বুক চিরে সোজা দক্ষিণে। পূর্বদিকে চিরুনির দাঁতের মতো মেঘাচ্ছন্ন সবুজ মৌন গম্ভীর মায়ানমারের পাহাড়সারি চলছে তো চলছেই। পশ্চিমে টেকনাফের পাহাড় বিশাল উচ্চতা থেকে ক্রমশ নিচু হতে হতে একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে গেছে নীল দরিয়ার বুকে। এর মাঝখানে নাফ নদীর স্বচ্ছ জলধারা। দেখতে দেখতে আমাদের

নৌযান নদী ছেড়ে সাগরে পড়লো। সামনে বঙ্গোপসাগরের বিপুল তরঙ্গ। ঢেউয়ের দোলায় কিছুটা শংকা, কিছুটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি নিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চললো সমুদ্রযান। একসময় দক্ষিণ পশ্চিমের নীল জলরাশি ফুঁড়ে সবুজের আভাস জেগে উঠলো। সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে একযোগে বলে উঠলো ঐ সবুজ দ্বীপটিই সেন্টমার্টিন। আমরা যতই এগুচ্ছি সেন্টমার্টিন আমাদের কাছে ততই স্পষ্ট হতে লাগলো। ডিম্বাকৃতি সবুজ দ্বীপের চারদিকের নীল পানির রং গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে লাগলো। আমরা সবাই বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছি। এ যেন স্বপ্নে আঁকা ছবির চেয়েও আরো সুন্দর, আরো বর্ণিল। দু-চোখ জুড়িয়ে গেল, মন-প্রাণ ভরে গেল। কাঠের তৈরি বেশ উঁচু একটি জেটি চোখে পড়লো। আমাদের যানটি ধীরে ধীরে সেখানেই ভিড়লো। ঐ জেটির সাহায্যেই প্রথম পা রাখলাম দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনে যা বহুকাল থেকে নামে চেনা, স্বপ্নে দেখা ।

দ্বীপে নেমেই চোখে পড়লো সাগরের ফেনিল ঢেউ এসে কী যেন এক বেদনায় নিষ্ফল মাথা কুটে মরছে বালির মধ্যে জেগে থাকা অজস্র ছড়ানো ছিটানো নিথর আদিম পাথরগুলোর ওপর। আর খানিকটা দূর থেকে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যে সমব্যথী দর্শক হয়ে আবেগে কেঁপে উঠছে হাজার হাজার নারকেল-কেয়া গাছের শাখা প্রশাখা। বড় নান্দনিক সে দৃশ্য। কিছুদূর যেতেই দেখা যায় হোটেল ও সাইক্লোন সেন্টার। বাড়িঘর যা আছে তার অধিকাংশই বাঁশের বেড়া দেয়া নারকেল-কেয়াপাতার ছাউনির ঘর। যাওয়ার পথে একটি ছোট দোকানে দাঁড়িয়ে ডাব খেলাম আমরা। ডাব খাওয়ার মাঝে স্থানীয় এক শিক্ষকের সাথে আলাপে জানতে পারলাম ছোট বড় চারটি দ্বীপ নিয়ে সেন্টমার্টিন্স গঠিত। আমরা যে দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি সেটাই প্রধান দ্বীপ। প্রায় দেড়শ বছর আগে সমুদ্রের বুক থেকে জেগে ওঠা এই দ্বীপে এক সময় আরব বণিকরা এসে তাদের বাণিজ্য তরী ভিড়িয়ে বিশ্রাম নিতেন। নারকেল গাছের প্রাধান্য ছিল বলে স্থানীয় লোকমুখে এর পরিচিতি ঘটে নারকেল জিঞ্জিরা বলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোন এক সময় চট্টগ্রাম জেলার গভর্নর (মতান্তরে বৃটিশ ধর্মযাজক) মার্টিনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সেন্টমার্টিন। সেন্টমার্টিন দ্বীপ জেগে ওঠার কয়েক বছরের মধ্যে মাত্র ১৩টি পরিবার এসে বসবাস শুরু করলেও এর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

নির্জন দ্বীপের স্তব্ধতার মাঝে ঢেউয়ের গর্জন আর বাতাসের মাতামাতি যেন সুরে ঐকতান হয়ে নিয়ে গেল অন্য এক ভুবনে। কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। নিজেকে আবিষ্কার করি বেলাভূমির মসৃণ এক পাথরে। দেখলাম সাগরের মাঝে বহুদূর অবধি এক প্রবাল পাথরের পথ পানিতে ডুবে আছে। স্বচ্ছ নীল পানির নিচে পরিষ্কার দেখা যায় হরেক রকম প্রবাল পাথর। কোনটি সাদা কড়ির মতো, কোনটি ফুটন্ত ফুলের মতো। কোনটি মনে হলো শাখা প্রশাখা মেলে দেয়া। কোনটির গড়ন মৌচাকের মতো, আবার কোনটি করোটির ভেতরের মগজের মতো। বেগুনি, কালচে, সবুজ বিভিন্ন রঙের শক্ত প্রবাল ছড়িয়ে আছে সাগরের তলদেশে। যার ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। তবুও এগিয়ে গেলাম ডুবন্ত ঐ পাথুরে পথ ধরে। এর মাঝেই স্ত্রী কানের কাছে এসে জানিয়ে দিল, প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের বাড়ি 'সমুদ্র বিলাস' এক নজর দেখতে চায়। বাড়িটি খুব কাছেই, তাই যেই বলা সেই কাজ। কিন্তু দর্শনলাভের পর হতাশ হতে হলো সবাইকে। বাড়িটি অনেকটা পরিত্যক্ত বলাই সঙ্গত, মোটেই প্রাসাদোপম নয়। কংক্রিট ঢালাই এর ওপর টিনের ছাউনি দেয়া একতলা বাড়ি। ছাদের টিন সবুজ রং করা। ছোট্ট উঠান সবুজ ঘাস আর জংলা লতায় ভরা। তবুও প্রিয় লেখকের বিখ্যাত বাড়ি দেখতে পাওয়ার তৃপ্তি ওর চোখে মুখে।

সমুদ্র বিলাস দেখে দ্রুত চললাম পূর্ব তীরের দিকে। বাজারে এসে একটি হোটেলে খেতে বসলাম সবাই। সামুদ্রিক ভেটকি ও রূপচাঁদা মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খেলাম। হাতে বেশি সময় না থাকায় খাওয়া শেষে দ্রুত পা চালিয়ে জেটি পেরিয়ে আবারও সেই কেয়ারী সিন্দাবাদ। এবার জায়গা নিয়েছি ছাদে। চারিদিকে তাকিয়ে আবারও চমৎকৃত হলাম। স্রোতের ওপর দিয়ে ভেসে আসা বৈকালিক সূর্যের তরল সোনার মতো রং কালো পাথর আর বালিয়াড়ির গা ছুঁয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে সারি সারি নারকেল আর কেয়ার সবুজ পাতা। দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে সে সোনা রং। বর্ণনাতীত সে দৃশ্যের নান্দনিকতা। অভিভূত হয়ে ভাবছিলাম, যদি এই চেয়ে থাকার শেষ না হতো। যদি এই ভালো লাগার শেষ না হতো। কিন্তু তা হবার নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেসুরো এক হর্ণ বাজিয়ে চলতে শুরু করল সমুদ্রযান। স্বর্ণদ্বীপ সেন্টমার্টিন ছেড়ে যেতে হচ্ছে ভাবতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মনে হতে লাগলো হয়তো আরো কিছু সময় থাকতে হতো, হয়তো আরো কিছু দেখার ছিল। আরো অনেক কিছু . . . . . . ।

লেখক: ডিডি, ডিবিআই-৩

যুদ্ধ শিশু-২

শাহীন আখতার

সত্যের সাথে প্রতিনিয়ত আমার
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলে নিভৃতে
আমার আগামী ভবিষ্যতের সাথে
একটি সম্মুখ সাহসী যুদ্ধের আশঙ্কায়
কাটছে অস্থির সময় একান্তে।
আমার অনড় ছোট্ট শিশু পুত্র ও কন্যার
'বাবা' আমরা 'দাদু বাড়ি যাব',
'আমরা নানু বাড়ি যাব'–
এই কঠিন ও শক্তিশালী আকুতির সম্মুখে
দাঁড়িয়ে আমি আন্দোলিত হই, দুঃখী হয়ে উঠি
রচিত স্বপ্ন হারাবার ভয়ে।
প্রার্থনা শুধু পরম করুণাময়ের কাছে,
আমি যেন জয়ী হই এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে।
আমি কেমন করে বলি তাদের
আমার কোন আনন্দময় শিশুবেলা নেই,
ঘুমপাড়ানীর গান নেই। কতো কি নেই!
কি করে বলি,
নির্মম জন্মলগ্ন হতে বর্ণিল সৌন্দর্যে
বেড়ে ওঠা আমার ভাষা, আমার স্বপ্ন
কানাডিয়ান নিঃসন্তান বাবা-মাকে ঘিরে।
আমি এক গর্বিত দেশের 'যুদ্ধশিশু' হতে
বহুজাতিক কোম্পানীর কর্ণধার,
যার বাবার নাম 'বাংলাদেশ',
মায়ের নাম 'বাংলাদেশ'।
সেই দেশের লতা-পাতা আর ফুল-পাখিরা
তার আত্মীয় স্বজন।
প্রিয় বাংলাদেশ,
আমি ভালোবাসি তোমায়,
আমায় আস্থা দাও, আমায় শক্তি দাও
কঠিন শর্তের আঙিনায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়।
ভীষণ ভালোবাসি তোমায়।।

ফাগুন

লিজা ফাহমিদা

বিকেলটাকে মুঠোয় পুড়ে
চাঁদকে দেখি আকাশজুড়ে
ঠিক তখুনি...
তোর কথা খুব মনে পড়ে।
রোজ বিকেলের কাব্যনামা
চায়ের কাপে একটু থামা,
তুই এখনো 'শক্তি' পড়িস?
'সুনীল' কিংবা 'তিলোত্তমা'?
হঠাৎ যদি টিএসসিতে
সবুজ ঘাসে অতর্কিতে;
সেই হ্যামিলন বংশী বাজায়
ভুল কি ছিলো সম্মতিতে!
এই এতসব টুকিটাকি
লক্ষ হাজার কথার ফাঁকি;
ফাগুন হাওয়ার বই মেলাতে
রিকশা চড়ে আসবি নাকি?

দাউ দাউ পুড়ে যায় গান্ধারীঅন্ধকার

শৈলেন্দ্র নাথ বর্মা

জলজ শৈবাল হেঁটে যায় জলদিঘীময়, হাই তোলে কিশোরীঢেউ
ঝিনুক বোধে না জলজফেনা, ভাবনার এভিন্যু খোলে
পলাতক কুড়ানো সময়, শূন্যঠোঁট, জলপিপি উড়ে যায় রূপোলি জোছনায়।
হ্যালোজেনের লাইট জ্বলে ওঠে,রৌদ্রালীগন্ধ সত্তা জুড়ে
কখনো চোখ বুজে, বেদনার তাপ ঝরে
ড্রয়িংরুমের পাশে সিঁড়ি, ডোরবেল বেজে ওঠে সময়-অসময়
পাশে বাগানবাড়ি, এখানে প্রতিবাদী কলরব ভাসে দুপুর-বিকেল

ক্ষত জায়গাটা টাটায় দুরন্ত টাটায় টনটন করে বেলা-অবেলায়
গভীর রাতে ঘুম ভাঙে, বিমূঢ় স্বপ্ন ভাবায় অনেক ...
গুলমা পাহাড়ে কাঠবিড়ালী নাচে, নাচায় বন্যপ্রাণিকে
কি জীবনবোধ, কি কল্পকাহিনী, উঠোনময় অনুভূতির সত্তা হেঁটে যায়
আর এইসবের সাথে মিশে আছে আমার আমাদের পথ
পথঘাট দুঃখদুপুর গ্রামভাব কত কিছুই
আসতে যেতে সন্ধে হয় হয়, পাশে রেজিমেন্ট মার্চপাস্ট করে চলে যায়
মনোনীতার পাশের তেপান্তরে
দূর থেকে ভেসে আসছে ধ্বনি, খামারবাড়ির দিকে হাঁটা দেয়
বরকতের নাতি ও নাতনি
উত্তপ্তদুপুর ঘুমের আরাধনায় নীলছায়া জ্যাকেট পরে হেঁটে যায়
ফাগুনের রক্তিম আভা ছড়িয়ে লাবণ্য বসন্তসত্তায়
বিনম্র মায়াচোখে উষ্ণতা ছোঁয়ায় অরণ্যাণীর চিবুক
নক্ষত্র খসে পড়ে, ফিকে হয় ঘনিষ্ঠউত্তাপ প্রাণের
যেখানে শেষ নেই শব্দ ও গল্পের, নেই সমষ্টিরঙের
আশ্চর্য, উৎস শাহবাগ প্রজন্ম চত্বর। উদ্বেগ থাকে আশা থাকে
আত্মজিজ্ঞাসা থাকে, উত্তাপ বাড়ে উল্লাস আর রাঙা রাজপথের

এই দেহ ছুঁয়ে
পরম্পরায় মানুষের সভ্যতা গড়ে ওঠে, এক নতুনজীবন ছুঁয়ে দাঁড়ায়
পাখির গল্প মুছে যায় বেদনার বালুচর জেগে থাকে সারারাত
খাণ্ডববনে আগুনে দাউ দাউ পুড়ে যায় চোখবাঁধা গান্ধারীঅন্ধকার।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

কেবলেই কাজ চলে

কেবলেই কাজ চলে, তার সাথে মাত্র
কক্ষনো লেখে না তো যারা ভাল ছাত্র
দুটিরই অর্থ এক এবং অভিন্ন
সুতরাং একটিকে করো নিশ্চিহ্ন।

[আমরা অনেকেই লিখি, 'কেবলমাত্র', 'শুধুমাত্র'। দুটি শব্দই ভুল। লিখতে হবে, হয় 'কেবল' নয় 'মাত্র'। নাহলে হয় 'শুধু' নয় 'মাত্র'। 'কেবল', 'শুধু' এবং 'মাত্র' সমার্থক, সুতরাং তিনটির যে কোন একটি লেখাই যথেষ্ট। যেমন, 'কেবল দলের সদস্যরাই এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারবেন।' এখানে 'কেবল'–এর সঙ্গে 'মাত্র' জুড়ে দেবার কোন দরকার নেই। 'এখনও তারে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশি শুনেছি।' এখানেও একই কথা। 'শুধু'র সঙ্গে 'মাত্র' বসবে না। 'মাত্র এইটুকু আমাকে দিলে!' এখানেও 'মাত্র'র সঙ্গে 'কেবল' বা 'শুধু' যুক্ত হবে না।

'মাত্র' শব্দের অন্য একটি অর্থ 'সঙ্গেসঙ্গে'। যেমন, 'শোনামাত্রই আমি গিয়েছি।' এর আরও একটি অর্থ 'প্রত্যেক'। যেমন, 'বাবা-মার সেবা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য।']

বান্দরবানের প্রয়াত বোমাং রাজার প্রতি ডেপুটি গভর্নরের শ্রদ্ধা নিবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বান্দরবানের প্রয়াত বোমাং রাজা কে এস প্রু চৌধুরী (ক্য সাইন প্রু) এর প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর এবং বোমাং রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠতম সদস্য উ চ প্রু রাজকুমার উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি গভর্নর প্রয়াত রাজার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং শোক বার্তা স্মারক বহিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রয়াত বোমাং রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম

ময়মনসিংহ অফিসে ব্যাংক ক্লাবের কার্যকরী কমিটি গঠন

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসে সম্প্রতি ব্যাংক ক্লাবের কার্যকরী কমিটি- ২০১৩ গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সদস্যরা হলেন- তোফাজ্জল হোসেন খান- সভাপতি, মোহাম্মদ আলী এবং মোঃ আব্দুল হাছিব- সহ সভাপতি, মোঃ আরিফ রব্বানী- সাধারণ সম্পাদক, মোঃ আতাউর রহমান-১ এবং ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ রাজা- সহ সাধারণ সম্পাদক, মোঃ ইদ্রিছ আলী- কোষাধ্যক্ষ, মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক- সাংগঠনিক সম্পাদক, মোঃ রবিউল করিম- ক্রীড়া সম্পাদক, মোঃ মিজানুর রহমান- প্রচার সম্পাদক, মোঃ আব্দুল বাতেন মোল্লা- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মোঃ সুলতান আহমেদ- দপ্তর সম্পাদক এবং রনু চন্দ্র দে- নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক । এছাড়া সমস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন শামছুদ্দিন হানিফি, মোঃ সামছুল হক, মোঃ ফজলুল করিম, মোঃ গোলাম মোস্তফা, মোঃ আব্দুল আজিজ এবং সামসুদ্দিন আহমদ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহ এর নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি

বড় অংকের ঋণ পর্যবেক্ষণে বিশেষ সফটওয়্যার

ড. আতিউর রহমান সফটওয়্যার উদ্বোধন করছেন

ব্যাংকগুলোর বড় অংকের ঋণ পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বিশেষ সফটওয়্যার চালু করেছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাংকের কোন গ্রাহক কী পরিমাণ ঋণ নিচ্ছে, ঋণের যথাযথভাবে ব্যবহার, গ্রাহক ইতিপূর্বে ঋণখেলাপি হয়েছে কি না এবং এর আগে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে তার পরিমাণ প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যাবে।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এ সফটওয়্যারটির উদ্বোধন করেন। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, এস কে সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও মহাব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, এ সফটওয়্যারটি চালু করার ফলে প্রতিটি ব্যাংকের নন-ফান্ডেড ঋণের রূপান্তর, ধারাবাহিক পরিবর্তন এবং এর পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে। বর্তমান সময়ে বড় অংকের ঋণের খেলাপি রোধে এসকল তথ্য ভীষণ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, দেশের তফসিলি ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বড় অংকের ঋণ সম্পর্কিত তথ্যের রিপোর্টিং সহজ করতে এ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বড় অংকের ঋণ তদারকি করা সম্ভব হবে। এ পদ্ধতিতে বড় অংকের ঋণ বিতরণে অনিয়ম তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরে আসবে। ফলে অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভব হবে। পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণেও স্বচ্ছতা আসবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা নিবাস, বনানী ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রিপারেটরি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটির তিনটি পর্বের প্রথম পর্বে ছাত্রছাত্রীরা প্রভাত ফেরী এবং শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। দ্বিতীয় পর্বে ছিল ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 'যেমন খুশি তেমন সাজো' প্রদর্শন এবং তৃতীয় পর্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে উপজীব্য করে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কল্যাণ সমিতির সভাপতি মোঃ শহীদুর রহমান, ডিজিএম, এইচআরডি, প্রধান কার্যালয়

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় সচরাচর বার্তা

মোঃ ইকরামুল কবীর

ইন্টারনেটে ব্রাউজ করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সময়ই দেখি 404 page not found বা 503 service unavailable এরকম Error। এছাড়াও আরো বিভিন্ন HTTP success অথবা Error কোড চোখে পড়ে আমাদের। কিন্তু অনেকেই জানেন না বিভিন্ন নম্বর সম্বলিত সেই কোডগুলো সম্বন্ধে। তাই আজ আমি সেই কোডগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে চেষ্টা করবো।

400 Bad Request

এ কোড বুঝায় যে রিকোয়েস্ট পদবিন্যাসে ভুল রয়েছে।

401 unauthorized

এটি 403 Forbidden কোডের অনুরূপ কিন্তু শুধু authentication সম্ভব হয়।

403 Forbidden

এ কোড দ্বারা বুঝায় রিকোয়েস্টটি একটি লিগ্যাল রিকোয়েস্ট ছিল, কিন্তু সার্ভার এ রিকোয়েস্টের জন্য Response করতে অসম্মতি জানাচ্ছে।

404 Not Found

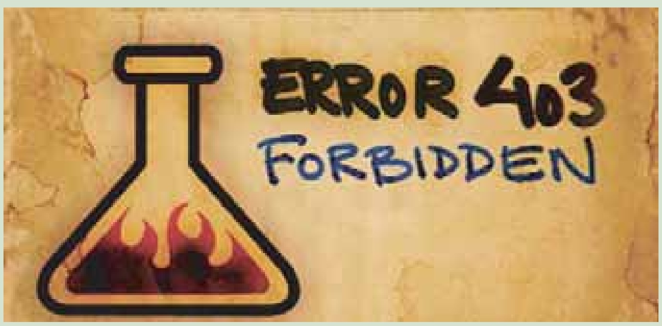

এ কোডের দ্বারা বুঝায় অনুরোধকৃত Resource বর্তমানে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে। এর পরবর্তীতে ক্লায়েন্টের আরো রিকোয়েস্ট করা অনুমোদিত।

405 Method Not Allowed

এ কোড দ্বারা বুঝায় এমন একটি পদ্ধতির সাহায্যে রিসোর্স রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যা ঐ রিসোর্স সাপোর্ট করেনা। উদাহরণস্বরূপ: যেখানে Post প্রয়োজন সেখানে GET পদ্ধতি ব্যবহার করলে এ স্টেটাস কোডটি প্রদর্শিত হবে।

408 Request Timeout

এ কোড দ্বারা বুঝায় রিকোয়েস্টের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সার্ভারের টাইম আউট হয়ে গেছে।

410 Gone

এ কোড দ্বারা বুঝায় যে অনুরোধকৃত Resource এখন আর পাওয়া সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতেও পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

504 Gateway timeout

এ কোডটি থেকে বুঝা যায় সার্ভারটি একটি gateway বা proxy হিসেবে কাজ করছিল এবং এটি ডাউন-স্ট্রীম সার্ভার থেকে সময় মতো একটি রিকোয়েস্ট পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি),
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট
ই মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

নেট বিনোদন

ষোল কোটি মানুষের জন্যে ফল দিতে হচ্ছে তো, তাই একটু কষ্ট করেই দাঁড়িয়ে আছি

আমার আবার এক কুড়ি ছেলেমেয়ে

আম্মু বলেছে– দাঁত সাফ করতে, তাহলে আমাকে ছাতু কিনে দেবে

২০১২ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

ফারজানা ইয়াসমিন (বর্না)
সরকারী পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

মাতা ঃ মোসাঃ আকতারী জাহান
পিতা ঃ মোঃ বদর উদ্দিন
(ডিএম, রাজশাহী অফিস)

অনুরাধা রায় দোলন
উইলস লিটল স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা ঃ নিশি মৈত্র মালা
পিতা ঃ মৃন্ময় কুমার রায়
(ডিইসিও, মতিঝিল অফিস)

শামসাদ নাভিয়া নাভলী
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা ঃ শাহানা সুলতানা
(ডিডি, এফইআইডি, প্র.কা)
পিতা ঃ এস, এম, এইচ আলী

আইনিন
এ, কে হাই স্কুল এন্ড কলেজ, দনিয়া, ঢাকা

মাতা ঃ রোমেনা পারভীন
পিতা ঃ জি, এম সাকলায়েন
(ডিডি, আইন বিভাগ, প্র.কা)

নাবিহা ইবনাত
ডাঃ খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা ঃ ছলিমা বেগম
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)
পিতা ঃ মোঃ আশরাফ উদ্দিন

তাসকিয়া খানম (রাফা)
রশিদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর

মাতা ঃ সাহিদা খানম
পিতা ঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন খান
(ডিএম (ক্যাশ) মতিঝিল অফিস)

মেহেদী হাসান রুমী
সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর

মাতা ঃ রোকেয়া সুলতানা
পিতা ঃ মোঃ হারুনুর রশিদ-৪
(এএম (ক্যাশ), সিলেট অফিস)

নোশিন নাওয়ার
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা ঃ শামিমা সুলতানা
পিতা ঃ মোঃ আব্দুল হাকিম
(ডিজিএম, এসিএফআইডি, প্র.কা)

সাদিয়া আফরিন
নারায়ণগঞ্জ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়

মাতা ঃ মোছাঃ জহুরা আক্তার খাতুন
পিতা ঃ মোঃ আব্দুস ছাত্তার
(ডিজিএম, সিএসডি-১, প্র.কা)

আফরিদা তাবাসসুম (তমা)
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা ঃ মখলেশা পারভীন (বিউটি)
পিতা ঃ মোঃ আবু তাহের সরকার
(এএম (ক্যাশ) মতিঝিল অফিস)

নাঈমা তাসনিম তুলি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা ঃ ফেরদৌসী আক্তার
পিতা ঃ মোঃ আখতার হোসেন-৩
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

রিফাত আরা নীরা
যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাই স্কুল

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতাঃ শাহনাজ আছমত উল্লাহ
পিতাঃ মোঃ আছমত উল্লাহ
(জেডি, ডিসিপি, প্র. কা.)

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

দিলশাত ফারিয়ান ফাইজা
স্কলারস্ স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা ঃ ডালিয়া মঞ্জুর
পিতা ঃ মোঃ মঞ্জুর হোসেন খান
(ডিডি, ডিবিআই, বগুড়া অফিস)

ওয়াসিফ আহমেদ (নিলয়)
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল

মাতা ঃ ইসমত আরা
পিতা ঃ শামীম আহমেদ
(ডিডি, বিআরপিডি, প্র.কা)

আনিকা আনজুম
সিলভার বেলস্ কিন্ডারগার্টেন এন্ড গার্লস হাই স্কুল

মাতাঃ শামিমা ইয়াসমিন
পিতাঃ মোহাম্মদ সরওয়ারুল আলম
(ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)

সাবরীনা আকতার রীয়া
মাইলস্টোন প্রিপারেটরী কেজি স্কুল, উত্তরা, ঢাকা

মাতা ঃ লাইলী বিলকিস
পিতা ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম-৯
(এডি, সিএসডি-১, প্র.কা)

ফজলে রাব্বী নাঈম
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতাঃ হোসনে আরা বেগম
(অফিসার, ইএমডি, প্র.কা)
পিতাঃ মোঃ মিজানুর রহমান
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

সৃজন দীপ তালুকদার
মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

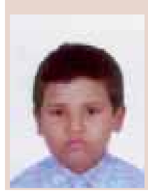

মাতাঃ শিউলী দত্ত
(এডি, এবিডি, প্র.কা)
পিতাঃ লোকেশ রঞ্জন তালুকদার
(এডি, মতিঝিল অফিস)

মোঃ আতাউর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং অর্থ ও মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে থাকে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একাডেমিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান অপরিহার্য। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাতে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান বর্তমানে একাডেমীর প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন। ট্রেনিং একাডেমীর বর্তমান কার্যক্রম, ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি এবারের পর্বে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বিবিটিএ মার্চ ১৯৭৭ সালে যাত্রা শুরু করে। অক্টোবর ২০০৬ থেকে মিরপুর-২ এ নিজস্ব ভবনে বিবিটিএ'র কার্যক্রম শুরু হয়।

একাডেমীতে কি ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়?

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম অন্য সব প্রতিষ্ঠান হতে স্বতন্ত্র। তাই এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আলাদা ও স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। এই ট্রেনিং একাডেমীও সেরকম একটি স্বতন্ত্র এবং একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা দেশের অর্থ ও মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম, আইন, বিধি-বিধান এবং এর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের সম্যক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ব্যাংকিং সুপারভিশন, অর্থনীতি, মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমসাময়িক বিধান, আইন, ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, গ্রিন ব্যাংকিং, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, জাল নোট সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য বছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের জন্য ছয়মাস মেয়াদী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। গভর্নর মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ১৫ দিনের জন্য তাদেরকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষকদের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলায় পাঠানো হয়। এসময় তারা কৃষকদের সুবিধা - অসুবিধা, এসএমই ও কৃষি ঋণের অবস্থা ও সমস্যা, কোন কৃষিপণ্যের কোথায় কী রকম সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন।

বিবিটিএ বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে কি-না ?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ ও মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, যার প্রত্যক্ষ অংশীদার দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমী হলেও বিবিটিএ'র বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্যও প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়া ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে বিবিটিএ বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এসব কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী বা তাদের প্রতিষ্ঠানকে কোন অর্থ প্রদান করতে হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন-বিধি-বিধান, অর্থ ও মুদ্রা বাজার, মুদ্রানীতি, অর্থনীতি, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, জাল নোট সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

ট্রেনিং একাডেমী হিসেবে বিবিটিএ'তে কি কি সুবিধাদি রয়েছে ?

একটি আধুনিক ট্রেনিং একাডেমীতে যেসব সুবিধা থাকার প্রয়োজন তার প্রায় সব কিছুই বিবিটিএ'তে আছে । যেমন- মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ, ইন্টারনেট সংযোগসহ ৩টি কম্পিউটার ল্যাব, কনফারেন্স রুম, ৪৫৮ আসন বিশিষ্ট একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম। অডিটোরিয়ামে ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক Wi Fi এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা ব্যবহারের উপযোগী করার কাজ চলছে। বিবিটিএ'তে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। এখানকার হোস্টেলে ১০৪টি কক্ষ আছে। এ ছাড়া হোস্টেলে রয়েছে নিউজ পেপার রিডিং রুম, টিভি রুম, কমন রুম, গেস্ট রুম ও মসজিদ।

আন্তর্জাতিক কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিবিটিএ'র সমঝোতা (Collaboration) বা কোনরকম সম্পর্ক আছে কি-না?

এখন পর্যন্ত বিবিটিএ'র কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা ও সমঝোতা রয়েছে। আবার বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমঝোতা আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশ হিসেবে বিবিটিএ এবং এসব প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা সম্ভব। ব্যাংকিং খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানে শীর্ষ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন- IMF STI Singapore, Bank for International Settlement এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া Center for International Cooperation and Training on Agricultural banking (CICTAB), India ও European Union এর অর্থায়নে INSPIRED এর সাথে বিবিটিএ'র Collaboration রয়েছে। INSPIRED প্রকল্পের আওতায় বিবিটিএ'র অবকাঠামো ও অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে European Union সহায়তা করছে। বিবিটিএ ও SEDF/IFC এর যৌথ উদ্যোগে অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।

বিবিটিএ কর্তৃক বছরে কতগুলো প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা করা হয়?

প্রতি বছর প্রায় ১৭৫ টি কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালা বিবিটিএ থেকে করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ হয় ঢাকায় এবং অল্প কিছু হয় ঢাকার বাইরে। ২০১২ তে মোট কোর্স ও সেমিনার হয়েছে ১৭২টি। এর মধ্যে ১৫১টি হয়েছে ঢাকায় এবং ২১টি হয়েছে ঢাকার বাইরে আমাদের অন্য অফিসগুলোতে। এ কোর্সগুলোতে সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৮৬৮৪ জন ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী কোনো গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে কি-না ?

বিবিটিএ'র উদ্যোগে Thoughts on Banking and Finance নামে একটি গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রকাশ করা হবে। বছরে দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অর্থনীতি, ব্যাংকিং, অর্থ ও পুঁজিবাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণের ইচ্ছা আছে।

একাডেমীকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করার বিষয়ে আপনাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী?

গভর্নর মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এবং ডেপুটি গভর্নর-৩ মহোদয়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীকে Center of Excellence এ পরিণত করার জন্য আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে কোর্স বিনিময়, পরিচিতিমূলক সফর, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ইত্যাদির মাধ্যমে বিবিটিএ'কে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী, জেডি, বিবিটিএ

সুন্দরবনে পাখি

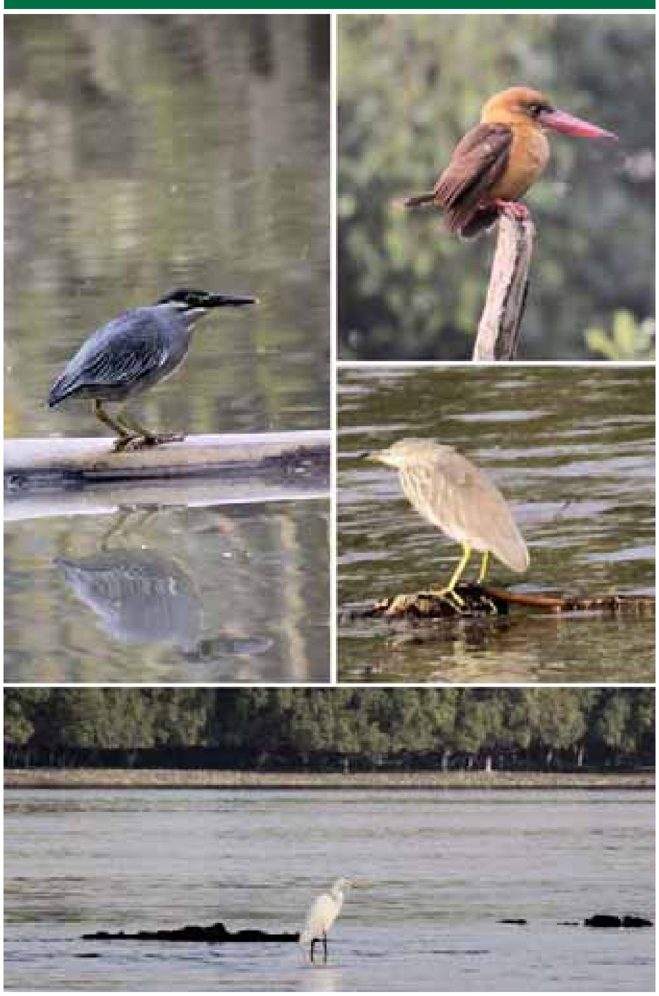

আলোকচিত্র: আনোয়ারুল ইসলাম, ডিজিএম, বিআরপিডি

বডি মাস ইনডেক্স নির্ণয়ের ফর্মুলা

বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) হচ্ছে একজন ব্যক্তির ওজন ও উচ্চতা অনুসারে শরীরের আকার নির্ধারণ। এর মাধ্যমে জানা যায় শরীরের ওজন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা। বিএমআই নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে ঃ

BMI=Weight (kg)/[Height (m) x Height (m)]

বিএমআই নির্ণয়ের জন্য হালকা ওজনের জামা কাপড় পরা অবস্থায় (ভারি কাপড় ও জুতা খুলে রাখতে হবে) কেজিতে শরীরের ওজন নিন। এবার খালি পায়ে সোজা অবস্থায় দাঁড়িয়ে মাথার (চুল নয়) খুলি বরাবর মিটারে আপনার উচ্চতা মাপুন। কেজিতে নির্ণয় করা শরীরের ওজনকে মিটারে নির্ণয় করা (উচ্চতা x উচ্চতা) দিয়ে ভাগ করুন। যেমন আপনার ওজন ৬৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৫৭ মিটার হলে, বিএমআই হবে = (৬৫/১.৫৭x১.৫৭)=২৬.৩৭০২। এ পদ্ধতিতে প্রতি মাসে অন্তত দু'বার বিএমআই নিরূপণ করে নিজের ওজন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বিএমআই

- ১৮.৫ এর কম হলে ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম আছে বুঝতে হবে (১৮.৫ থেকে ২৪.৯ হলে ওজন স্বাভাবিক ধরা হয়)।
- ২৫ থেকে ২৯.৯ হলে ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আছে অর্থাৎ 'ওভারওয়েট' বুঝতে হবে।
- ৩০ বা এর চেয়ে বেশি হলে ওবেজ অর্থাৎ মোটা মানুষের দলভুক্ত হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

Category	BMI range - kg/m^2	BMI Prime
Very severely underweight	less than 15	less than 0.60
Severely underweight	from 15.0 to 16.0	from 0.60 to 0.64
Underweight	from 16.0 to 18.5	from 0.64 to 0.74
Normal (healthy weight)	from 18.5 to 25	from 0.74 to 1.0
Overweight	from 25 to 30	from 1.0 to 1.2
Obese Class I (Moderately obese)	from 30 to 35	from 1.2 to 1.4
Obese Class II (Severely obase)	from 35 to 40	from 1.4 to 1.6
Obase Class III (Very severely obase)	over 40	over 1.6

ওজন কম বা বেশি হওয়া কোনটাই কাম্য নয়। সুস্থ ও কর্মময় জীবনের জন্য বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আপনার পেট কমানোর প্রয়োজন আছে কিনা তা বোঝার জন্য একটি সহজ পরীক্ষা এখনই করে ফেলুন। সোজা দাঁড়িয়ে ও কোমর না বাঁকিয়ে শুধু ঘাড়টা সামনে ঝুঁকিয়ে আপনার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দেখার চেষ্টা করুন। সহজে দেখতে পেলে ভাল। কিন্তু ভুঁড়ির কারণে দেখতে সমস্যা হলে আর সময় নষ্ট না করে ব্যবস্থা নিন।

লেখক: ডা. মো. মাহফুজুল হোসেন, ডিসিএমও, বিবিএমসি

মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা ●৩৯ খণ্ড ● সংখ্যা ৪ ● চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৯-১৪২০ ●এপ্রিল, ২০১৩ ● রেজিস্ট্রেশনঃ ৩০/৭৫

বাঙালির নববর্ষ

চির নতুনের ডাক দিয়ে আবার এল বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। বিগত বছরের সব অপূর্ণতা, গ্লানি, ব্যর্থতা মুছে ফেলে জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার আশায় বাঙালি উদযাপন করতে যাচ্ছে তার একান্ত আপন নতুন বর্ষ। শুরু হতে যাচ্ছে আরও একটি নতুন বছর, ১৪২০ বঙ্গাব্দ। নববর্ষ মানেই নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন সংকল্প।

বাঙালির আত্মপরিচয় বহনকারী ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলা ভূখণ্ডের সব মানুষ বাংলা নববর্ষের নানা উৎসবে মেতে ওঠে। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালির নববর্ষ উদযাপন সারা পৃথিবীতে বিরল। অন্যদিকে, নববর্ষ উৎসব বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এ দেশে শাসকশ্রেণি যখনই তাদের অন্যায়-অন্যায্য শাসনকে ন্যায্যতা দিতে ধর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছে, তখন শোষণমুক্তির সংগ্রামে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছে তার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে বৈশাখের উৎসব বাঙালির আত্মপরিচয়ের আন্দোলন-সংগ্রামকে করেছে বেগবান। সেই একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে শুরু হলেও পয়লা বৈশাখের উৎসবের আড়ম্বর এখন শহরগুলোতেই বেশি। রাজধানী ঢাকায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে সূচিত বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ছাড়াও মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়, মেলা বসে। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতেও বসে বৈশাখী মেলা, আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ব্যবসায়ীরা খুলে বসেন হালখাতা। তরুণ-তরুণীরা বৈশাখী উৎসবের রঙিন পোশাক পরে বেরিয়ে আসে, ঐতিহ্যবাহী দেশি খাবারের উৎসব চলে। পথ-ঘাট, মাঠ-মঞ্চ—সবকিছু ভরে ওঠে নতুন প্রাণের উচ্ছ্বাসে। বাংলা নববর্ষকে ঘিরে দেশীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যরুচির মর্যাদা যেমন বেড়েছে, তেমনি আমাদের জীবনধারায় নতুন বেগ ও আবেগ সঞ্চার করেছে বাঙালিয়ানা। এই উৎসবে ঘটে মানুষে মানুষে মিলন ও সৌহার্দ্যের নবায়ন। দিনভর শুভেচ্ছা বিনিময় চলে; চিরায়ত বাঙালি নকশায় রঞ্জিত মাটির হাঁড়ি, বাঁশের পাত্র ভরে বিনিময় করা হয় নানা ধরনের মিষ্টান্ন, পিঠাপুলিসহ হরেক রকমের ঐতিহ্যবাহী খাবার। মানুষে মানুষে এমন মিলন, এমন সৌহার্দ্যময় পরিবেশ কেবল পয়লা বৈশাখের মতো অসাম্প্রদায়িক উৎসবেই দেখা যায়।

বাংলা নববর্ষ মানে নিজস্বতা, আপন ঐতিহ্যের প্রতি সমর্পণ, বাঙালি জাতি দর্শনের একমাত্র সর্বজনীন ঠিকানা। বাংলা নববর্ষে বাঙালি মণ্ডা-মিঠাই মুড়ি-মুড়কি, ইলিশ-পান্তা, হালখাতা আর বাউল গানের লোকজ সুরে মেতে উঠবে। সর্বগ্রাসী আন্তর্জাতিকতার প্রবল উৎপাতের মধ্যেও বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি এমন নিমগ্নতা আমাদের আশাবাদী করে। জীবনানন্দের ভাষায় যদি বলি ঃ

'... পৃথিবীর কোন পথে, নরম ধানের গন্ধ-কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত, শীত হাত খান,
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা – এরই মাঝে বাংলার প্রাণ... ।'

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : কালার ক্যাম্পাস, ৩২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।